শিশু ও শৈশব
অধ্যাপক রমেশ দাস
শিশু লালনী গ্রন্থমালা

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

বাবা-মারা সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁদের চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁরা ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন—এ নিয়ে তাঁদের মনে নানান জিজ্ঞাসাও জাগে। বাস্তবিকই ছোটদের মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝতে ও পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মাদের নানান অসুবিধায় পড়তে তো হয়ই—তা ছাড়াও মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেসব মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে, শিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাশ লাভ না করতে পারার মধ্যে। কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবকরা যাতে ছোটদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সবল-মনা প্রয়োজনীয় নাগরিক করে গ'ড়ে তুলতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, শিশু লালন ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করে, এই পুস্তিকামালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানের মতন একটি জটিল বিষয়কে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপন রচনা সম্ভারে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নাই—তাই আশা করি শিশু ও কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত করে তাঁদের সমাদর করবেন।

সম্পাদক

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

শিশুলালনী গ্রন্থমালা ঃ প্রথম পুস্তিকা

শিশু ও শৈশব

অধ্যাপক রমেশ দাস

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
হাওড়া

গোড়ার কথা

শিশুরাই জাতির ভাগ্য বিধাতা। আজ যারা শিশু, তারাই হবে ভাবীকালের সমাজ-নায়ক, রাষ্ট্র-চালক, শিল্পী ও বিজ্ঞানী। ভবিষ্যৎ যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে তারই বিপুল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বর্তমানে যারা শিশু, তাদেরই ভিতর। সুতরাং শিশুর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক অতি নিবিড়, সেই বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও কিশোর পরিচালকের দায়িত্ব অতিশয় গুরু। তাঁদেরই ওপর নির্ভর ক'রছে একটি বিরাট সম্ভাবনার সফলতা-বিফলতা। একটি বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি ক'রতে হলে ক্ষুদ্র বীজটিকে অযত্ন ক'রলে চলবে না। কোমল মাটি, স্নিগ্ধ জল, উজ্জ্বল আলোক, পরিমিত উত্তাপ, পর্যাপ্ত বাতাস দিয়ে যেমন একটি পরিপাটি পরিবেশ রচনা ক'রতে হবে, কীটপতঙ্গ পশুপাখির শত্রুতা থেকে বীজটিকে যেমন রক্ষা ক'রতে হবে—ঠিক তেমনি একটি শিশুর মধ্যে যে বিপুল ইঙ্গিত আছে, তাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে হলে অনেক যত্ন, অনেক চেষ্টা, অনেক সতর্কতা, সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন। ছোট বলে শিশুকে অবহেলা ক'রলে বা যথাযথ ভাবে তার প্রতি আচরণ না ক'রলে, শিশু ও সমাজ উভয়েরই ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে। সুতরাং শিশুর প্রতি সকলেরই সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের এতটুকু অসতর্কতা, আমাদের আচরণের এতটুকু অসামঞ্জস্যতার ফলে কতো রাশি রাশি সম্ভাবনা যে অঙ্কুরাবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে! কতো মহামূল্য সম্পদ আমরা নিজের হাতে অপচয় ক'রে ফেলি সে কথা কে জানে!

মানব-সমাজে চিরকালই শিশুর আবির্ভাব হয়েছে, চিরকালই সমাজ শিশুদের লালন-পালন ক'রে আসছে একথা খুবই সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভালো ক'রে শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে খুব অল্প দিন আগে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধমান দেশগুলিতে শিশুদের

বিপজ্জনক অঞ্চল হতে সরিয়ে নিরাপদ পরিবেশে নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। হাজার হাজার বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েকে তাদের চিরপরিচিত স্নেহবিজড়িত গৃহ-বেষ্টনী হতে বিচ্যুত ক'রে একত্র সম্মিলিত করার ফলে তাদের হাবভাব আচার আচরণে অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেলো। তখন কর্তৃপক্ষের নজর পড়লো শিশুদের ওপর এবং শিশু-সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা আহূত হলেন। এই সব বিজ্ঞানী শিশু-সমস্যাগুলির কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়ে শিশু-মনের বিচিত্র পরিচয় পেলেন। বিজ্ঞানীদের এই অভাবিত আবিষ্কার শিশুর মন সম্বন্ধে তাঁদের আরও বেশী কৌতূহলী ক'রে তুললো। শিশু-মনের ওপর নানা রকম পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং গবেষণা চলতে লাগলো। এই সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে যে সব মহামূল্য তথ্য আবিষ্কৃত হলো সেগুলিকে সংকলন ক'রে শিশু-মনস্তত্ত্বের ওপর বড় বড় গ্রন্থ রচিত হলো। শিশু-মনের রহস্য উন্মোচন করার এই যে প্রয়াস এর শেষ আজও হয়নি—কোন কালে হবেও না। কারণ বিজ্ঞানের গতি কোনদিনই স্তব্ধ হয়ে পড়েনা, চিরকালই সামনের দিকে এগিয়ে চলে—যদিও সময় সময় এই গতি মন্থর হয়ে আসে।

আজ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিকরা শিশু-মনের সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, সেগুলির ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি অত্যুন্নত দেশগুলিতে শিশুদের লালনপালন করা হয়। শিশুর শিক্ষা, চরিত্র-গঠন, সংশোধন সব কিছুই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও বিজ্ঞান-প্রীতির এই রকম পরিষ্কার দৃষ্টি ভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা আজ খুব বেশী।

শিশুর সঙ্গে যাঁরা মেলামেশা করেন একটু লক্ষ্য করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, শিশুদের মধ্যে এমন নানান রকমের সমস্যা রয়েছে যেগুলির সমাধান একান্তই দরকার। কোন একটি শিশু হয়তো নিতান্ত লাজুক,

কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। মার আঁচল ছেড়ে বাইরের-জগতে বেরিয়ে আসবার শক্তি তার নেই। ইস্কুলে যাবার কথা উঠলেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর একটি শিশু হয়তো ভারি দুষ্টু। তার কোন কিছুরই অভাব নেই অথচ সে অন্য ছেলেমেয়েদের বই চুরি ক'রে আনে। প্রতিবেশীর বাগানে গাছপালা ভাঙে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মারধোর করে। এই ধরণের আরও অনেক সমস্যা শিশুদের মধ্যে অহরহই দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিকেরা একটি বিষয়ে একমত যে, জীবনের প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে মানুষ যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার উত্তর-জীবন। "Morning shows the day" এ কথাটা খুবই বিজ্ঞান সম্মত। বয়স্কদের চিন্তা, ধারণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের আচরণের স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা, সমাজ ও কর্ম-জীবনে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুরই শিকড় নিহিত আছে তাদের শিশু-মনের কোমল মৃত্তিকার ভিতর—বহু বিচিত্র শৈশব অভিজ্ঞতার রূপ ধরে। সুতরাং একটি মানুষের জীবনে তার প্রথম পাঁচ-ছয়টি বৎসর অতিশয় মূল্যবান। কিন্তু তার এই অতি মূল্যবান সময়টি কীভাবে অতিবাহিত হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রছে তার মাতাপিতা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও পরিচালকের ওপর—বিশেষ ক'রে তার মাতাপিতার ওপর। বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে যাতে তাঁরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করতে পারেন সেই বিষয়ে তাঁদের যথাসাধ্য সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নিয়েই এই পুস্তিকাটি রচিত হলো।

মনোবিজ্ঞান বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

রমেশ দাস

শিশু-পালনে মাতাপিতার সমদায়িত্ব

সাধারণতঃ শিশু লালন কর্মে যদিও মাতাই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকেন তথাপি এ বিষয়ে পিতার দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। বিশেষতঃ একটি বালকের জীবনে অতি শৈশবকালেও পিতার সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বালক এবং বালিকা উভয়েই যদি পিতার ঘনিষ্ঠ সঙ্গ উপভোগ করবার সুযোগ পায়, তবে তাদের মনের বিকাশ পূর্ণতর হয়ে ওঠে। তাদের জীবন সুন্দরতর হয়ে থাকে। তাছাড়া মাতা ও পিতা উভয়েই যদি পুত্র-কন্যার লালন-পালন বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করেন, অতি সহজেই অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং পারিবারিক শান্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আন্তরিক সম্পর্ক বর্তমান, সন্তান পালন করতে গিয়ে তা যদি দিন-দিন নীরস হয়ে পড়ে, তা হলে সেই রকম মনোভাব নিয়ে তাঁরা শিশুদেরও যথাযথ ভাবে লালনপালন করতে পারেন না। ফলে একূল ওকূল, দুকূলই মাটি হয়। শিশুও যখন মাতাপিতার মধ্যে এই রকম স্নেহলেশহীন সম্বন্ধের সন্ধান পায় তখন তার কোমল অন্তরে গভীর আঘাত লাগে। শিশুর নিজের ওপর আস্থা জন্মে তখনই, যখন সে দেখে মাতাপিতা উভয়ের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক রয়েছে এবং উভয়েই তাকে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। অনেক সময় দেখা যায় পিতার রূঢ় ব্যবহারের জন্য শিশুর মনে তাঁর প্রতি একটা অকারণ ভীতি ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে। এই সব শিশু পিতার সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা ক'রে চলে এবং মাতার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এই রকম ব্যাপার শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। পিতার

এই রকম আচরণের জন্য কতো শিশুর মনে যে লোক-লজ্জা, হীনতার ভাব, আত্ম-কেন্দ্রিকতা এবং নানাবিধ নৈতিক অবনতির সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যার মাতাও অনুরূপ আচরণ করেন সে শিশু সত্যই ভাগ্যহীন। সুতরাং আমরা যদি সত্যসত্যই আমাদের শিশুদের মঙ্গল কামনা করি তাহলে আমাদের এতোদিনের ধারণা বদলাতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিশু স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সন্তান এবং তাকে লালন করার দায়িত্ব দুজনেরই সমান। শিশু-লালনে স্ত্রীর সহায়তা করায় স্বামীর লজ্জিত হবার কিছু নেই। পক্ষান্তরে এটা তাঁর একটা অতি বড় কর্তব্য কর্ম।

পাঠশালে পাঠানোর আগে

প্রথম পাঁচ-ছয়টি বৎসরের মধ্যে শিশুর জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার বৈচিত্র্য এবং দ্রুততা সত্যই বিস্ময়কর। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির বোধশক্তি জাগার ফলে, তার জীবনে নিত্যনূতন বিচিত্র ধরণের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। এবং প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা শিশুকে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলে। শিশুর স্মৃতি-শক্তি, তার কল্পনার সমৃদ্ধি, নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি, তার পর্যবেক্ষণের নিপুণতা, সবকিছুই বহুলাংশে নির্ভর করে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিধি ও গভীরতার ওপর। শিশু যত বড়ো হতে থাকে ততই তার ঘরের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাহির-বিশ্বে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন ঘটে। পাঁচ-ছ' বছর বয়সে তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিশু নিজেকে প্রস্তুত ক'রতে শেখে। আমাদের দেশে একটা ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন আছে। আমরা মনে করি যত অল্প বয়সে একটি শিশু শিক্ষালাভ আরম্ভ করে ততই ভালো। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা ছোট ছোট

মাথার ওপর জটিল জটিল বিষয়ের ভারি-ভারি বোঝা চাপিয়ে দিই। সেগুলি আয়ত্ত করতে গিয়ে শিশুর প্রাণান্ত হয়ে ওঠে। এতে হয় সে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি ক'রে আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, না হয় মাতাপিতার উৎসাহ ও প্রশংসাবাণীর লোভে তাঁদের চোখে ধূলো দিয়ে নানারকম অসদুপায় অবলম্বন করতে শেখে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে এতটা ব্যস্ততা অনাবশ্যক। সকল মাতাপিতাকেই একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখতে হবে যে, লেখাপড়া স্থুরু করবার আগে শিশুর দেহ ও মনের একটা বিশেষ রকমের পরিপুষ্টির প্রয়োজন আছে। লেখাপড়া করতে হলে শিশুকে চোখ, কান, হাত ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। স্থতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলি, স্নায়ুগুলি এবং পেশীগুলি বিশেষ ভাবে পরিপুষ্টি লাভ না করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে না। তার এই দেহগত অপরিপক্কতার জন্য তার মনের দিকেও পুষ্টির দৈন্য থেকে যাবে। কারণ দেহ এবং মন দুই নিয়েই শিশু একটি সম্পূর্ণ প্রাণী। একটির বিকাশের ওপর নির্ভর করছে আর একটির বিকাশ। শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে মাতাপিতাকে কতকগুলি কাজ করতে হবে। তার চোখ এবং কানের ক্ষমতা ভালো ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। চোখের এবং কানের দোষ প্রায়ই শিশুর পড়াশোনায় বাধার সৃষ্টি করে। অনেক মাতাপিতা এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এই সব কারণে শিশুকে ভুল বোঝেন এবং তাদের অক্ষমতার জন্য তাদের বুদ্ধির ওপর দোষারোপ করেন। শিশুও দিন-দিন লেখাপড়ার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অথচ ভালো ডাক্তারের সাহায্যে তাদের চোখ কানের স্থচিকিৎসা করালে তাদের পক্ষে লেখাপড়ায় যত্নবান এবং কৃতকার্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। শিশু যাতে নিজের ছোটখাটো কাজগুলো বিদ্যালয়ে যাবার আগে নিজে নিজেই

করতে শেখে সেদিকেও মাতাপিতাকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাছাড়া নিয়মিত শয্যাত্যাগ করা, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা, স্নান ও ভোজন করা ইত্যাদি সদভ্যাসগুলি বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে শেখাতে হবে। বিদ্যালয়ে যাবার আগেই যদি শিশুর মধ্যে স্বাবলম্বন, সদভ্যাস, সমাজ-চেতনা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের নূতন পরিবেশে সে নিজেকে সহজে মানিয়ে নিতে পারবেনা এবং বিদ্যাশিক্ষা তার কাছে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে মাতাপিতাকে অতিশয় মনোযোগী হতে হবে।

শিশুর দেহমনের বিকাশের ধারা

শিশুর দেহ এবং মন জন্মমুহূর্ত হতে সুরু ক'রে ধীরে ধীরে কী ভাবে বিকশিত, পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে—কী ভাবে তার দেহের বৃদ্ধি এবং মনের বিস্তৃতি ঘটে অনুধাবন ক'রলে সেটা সহজেই বোঝা যায়। সাধারণতঃ জন্মকাল থেকে এক বছরের মধ্যেই শিশুর দৈহিক ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং সে প্রথমে মাথা তুলতে পারে, তারপর বসতে এবং তারপর দাঁড়াতে শেখে। এক থেকে ছ' বছরের মধ্যে শিশু অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তার হাতগুলি ব্যবহার কর'তে পারে। সোজা হয়ে হাঁটতে শেখে। দৌড় ঝাঁপ করে। বিনা আয়াসে কথা বলতে পারে এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে মনের আনন্দে খেলা করবার ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণতঃ সকল শিশুরই শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের ধারাটি যদিও এই রকম তথাপি একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেটা হলো তাদের বিকাশের গতি। কেউ হয়তো বারো মাসে হাঁটতে শেখে, কারও বা ষোল মাস লাগে হাঁটতে। কেউ তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে, কারও বা কথা বলতে অনেক দেরী হয়। যদি কোন একটি শিশু তেরো মাসে হাঁটতে সুরু করে অথচ তার সমবয়সী

একটি শিশু তখনও ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছেনা তা হলে এ দেখে মাতাপিতার শঙ্কিত হবার কিছু নেই। কারণ যদিও জড়বুদ্ধি শিশুরা অনেক দেরীতে এবং খুব মন্থর গতিতে কথা বলতে এবং হাঁটতে শেখে তথাপি এও দেখা গেছে যে, অনেক বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী মানুষও অনেক দেরীতে চলতে এবং কথা বলতে শিখেছিলেন। মাতাপিতা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে, তাঁদের শিশু একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ ক'রে বেড়ে উঠেছে কী না, শিশু হাঁটার আগে বসতে পারছে কী না পা দুটোকে আয়ত্ত করবার আগে হাত দুটোকে যথারীতি ব্যবহার করছে কী না এই বিষয়-গুলিই তাঁদের অনুধাবনীয়। শিশুর এই সব কার্যকলাপের ওপর তাঁদের খুব বেশী হাত নেই—এগুলি প্রধানতঃ নির্ভর করছে তার শরীরের পরিপুষ্টির ওপর। অবশ্য এই পরিপুষ্টিকে তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে বিকশিত হবার সুযোগ দান ক'রতে পারেন। ক্ষুদ্র শিশুটির ওপর ভারি-ভারি একরাশ জামাকাপড় না চাপিয়ে, তাকে যদি প্রত্যেক দিন বেশ কিছু সময় খালি গায়ে রাখা যায়, তবে সে ইচ্ছামতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করবার সুযোগ পাবে। শিশুর চারিপাশে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী রাখলে সেগুলি নাড়াচাড়া ক'রে সে বিচিত্র ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ ক'রবে এবং তার স্নায়ুতন্ত্রী ও পেশীগুলি পরিপুষ্ট হবে। মাতাপিতা যদি বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাহলে সেও সহজ কথাবার্তা বলতে শিখবে। তাকে নিয়ে যদি ঘরময় ঘুরে বেড়ানো হয় তবে চলাফেরার ওপর তার সহজ অধিকার জন্মাবে এবং বিচিত্র বস্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তার মানসিক বিকাশকে দ্রুততর ক'রে তুলবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বলবার কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শিশুর পরিপুষ্টি ও বিকাশ যেমন একই গতিতে সম্পন্ন হয় না তেমনি আবার একটি শিশুরই জীবনে বিকাশ ও পুষ্টির গতিটিও সমান তালে চলে না। যেমন এক বছরের মধ্যে তার ওজন ও উচ্চতা অতিশয় দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু

তারপরই কয়েক বছর ধ'রে এই গতি মন্থর হয়ে আসে। অতএব কোন এক সময়ে শিশুর ওজন বা উচ্চতা বাড়ছে না দেখে শঙ্কান্বিত হবার খুব বেশী কারণ নেই—অন্য কোন দিকে (যেমন খাদ্যসংক্রান্ত বিষয়ে) যদি ত্রুটি না থাকে তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা চলে।

সাধারণতঃ কোন্ বয়সের শিশু কী ক'রতে পারে

এক বছরের শিশু—হামাগুড়ি দেয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে। নিজে নিজে বসতে পারে এবং বসে থাকা অবস্থায় নানাদিকে দেহটাকে ঘোরাতে পারে। তার হাত দুটো অন্য কেউ ধরলে সে দাঁড়াতে পারে। বছরের শেষের দিকে হাত দিয়ে মাটি থেকে টুকিটাকি জিনিষ কুড়িয়ে নেয় এবং পুনরায় সেগুলিকে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে আমোদ উপভোগ করে। তার চার পাঁচটা দাঁত বেরোয় এবং সে 'দা-দা', 'মা-মা' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে।

দু-বছরের শিশু—চারিপাশে দৌড়াদৌড়ি ক'রে বেড়ায়, যদিও মাঝে মাঝে তার পা ফস্কে যায়। বাক্স, দেরাজ প্রভৃতির ভেতর থেকে জিনিষপত্র বের করে ও আবার ভরে রাখে। নিজে নিজে একআধটু খেতে পারে এবং অন্য কেউ আর পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়তে গেলে সে কাজে তাদের অল্পবিস্তর সাহায্য করে। অর্থময় একক শব্দ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য প্রয়োগ ক'রতে শেখে। শুনে শুনে ছোট ছোট ছড়া কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে এবং সেগুলি আবৃত্তি ক'রে অন্যকে বিস্মিত ক'রে দেয়। এই সময়ে শিশুদের মধ্যে একটা "ঋণাত্মক" মনোভাব দেখা যায়—অর্থাৎ তাকে কোন কিছু করতে বললে প্রায়ই সে "না" বলে বসে। কিন্তু এতে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। এইরূপ মনোভাব শিশুর বিকাশের একটি অতি স্বাভাবিক স্তর মাত্র। এই সময়ের মধ্যে শিশুর প্রায় পনেরো ষোলটি দাঁত বেরিয়ে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এই

সময়ের শেষের দিকে শিশু তার মূত্রাশয় ও মলাশয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

তিন বছরের শিশু—এ সময়ে হাত ও পায়ের ব্যবহার রীতিমত বেড়ে যায়। শিশু চারিপাশে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি ক'রে জিনিষপত্র নেড়ে চেড়ে, ভেঙেচুরে ভারি আনন্দ পায়। বালির ঘর, দেশালায়ের রেল-গাড়ি ইত্যাদি তৈরী করে এবং নানারকম পুতুল নিয়ে খেলা করে। ছোট ছোট বাক্য স্বচ্ছন্দে ব্যবহার ক'রতে পারে। তাদের কথাবার্তা লক্ষ্য ক'রলে বোঝা যায়, বিশ্বজগতের অধিকাংশ সামগ্রীকেই তারা প্রাণবন্ত মনে করে। অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে নিজের মনের অনুভূতি আবেগ ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলি আরোপ ক'রে থাকে। এই সময় শিশু জড়বস্তু অপেক্ষা মানুষ এবং মানুষের আচার-আচরণের প্রতি বেশী ক'রে আকৃষ্ট হয়। তার চারপাশে যাঁরা অহরহ ভিড় ক'রে থাকেন সে তাঁদের অনুকরণ করবার প্রয়াস পায় এবং তাঁদের সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অসমর্থনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। এই সময়ে শিশু নিজেকে হাতী, ঘোড়া, ভালুক প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার কল্পনা ক'রে খেলার ভেতর দিয়ে নিজের নবোদ্গত ব্যক্তিত্বের ওপর নানারূপ পরীক্ষা ক'রে থাকে। এই সব খেলা শিশুর কল্পনাশক্তিকে প্রখর এবং ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলে। এই সব অভিনয়ের ভেতর দিয়ে সে সহজেই বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য উপলব্ধি করতে শেখে। এ সময়ের মধ্যে মোটমাট প্রায় কুড়িটি দাঁত বেরিয়ে থাকে।

চার বছরের শিশু—তিন বছরের শিশুর জীবন অতিশয় কর্ম-চঞ্চল। তাকে যদি 'কর্মবীর' আখ্যা দেওয়া যায় তবে চার বছরের শিশুকে 'দার্শনিক' বলতে হবে। কারণ এই সময়ে সব কিছু সম্বন্ধেই তার অপরিসীম কৌতূহল দেখা যায়। কেন? কী ক'রে? ইত্যাদি ধরণের প্রশ্ন চার বছরের শিশু প্রায়ই ব্যবহার করে। এসব থেকে তার

জ্ঞান পিপাসার গভীরতা, তার মানসিক বিকাশের দ্রুততা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু তার এই দার্শনিক মনোভাব তাকে অলস ক'রে ফেলে না। তার জীবনে কাজ এবং কল্পনা দুটোই সমানতালে পা ফেলে চলে। ছুটোছুটি, লাফালাফি, দাপাদাপির ও অন্ত থাকে না এ সময়ে। এই সময়টাতে শিশু নানারকম রূপকথার গল্প, ছেলেভুলানো ছড়া ইত্যাদি শুনতে ভারি ভালোবাসে। কারণ এগুলো তার কল্পনাকে সম্পদশালিনী ক'রে তোলে। এ সময়ে শিশু নিজে নিজে জামা কাপড় পরতে এবং ছাড়তে শেখে এবং হাতমুখ ধোওয়া ইত্যাদি কাজগুলো উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সম্পাদন ক'রতে পারে।

পাঁচ-ছ' বছরের শিশু—এই সময়ে শিশুর মধ্যে বেশ একটা স্বয়ং সম্পূর্ণতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন হয়ে ওঠে। মাতাপিতাকে গৃহকর্মে সহায়তা করে। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করে। অন্য কেউ পাশে না থাকলে সে নিরুৎসাহ বা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে না। নিজের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিতে দৌড়োদৌড়ি ক'রে, ফলফুল তুলে, পাতা ছিঁড়ে, পাখি দেখে অথবা ছবি এঁকে ভরিয়ে রাখে। অনেক সময় কল্পনাপ্রবণ শিশুরা বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে না এবং এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলে যেগুলো বাস্তব জগতে না ঘটে তার কল্পনাজগতেই ঘটে। মাতাপিতা অনেক সময় এদের ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না বরং তাদের মিথ্যাচারী মনে ক'রে নানাভাবে তিরস্কৃত ক'রে থাকেন। তাঁদের এই রকম আচরণ কিন্তু শিশুর কোমল মনে গভীর আবেগের সঞ্চার ক'রে থাকে।

শিশুর ভাষা শিক্ষা

শিশু যখন ভাষা আয়ত্ত করে তখন তার মনের রীতিমত বিকাশ সংঘটিত হয়। ভাষান্তর্গত শব্দগুলি এক একটি বস্তু, কাজ বা ঘটনার

প্রতীক মাত্র। যখন একটি বিশেষ বস্তু, কাজ বা ঘটনার সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দ (নাম) বার বার সংযুক্ত হয়—অর্থাৎ শিশু কোন একটা বস্তু যখন দেখছে তখন তার মাতাপিতা বা সঙ্গীসাথীরা যখন বার-বার বস্তুটার নাম উচ্চারণ করেন তা'তে কেবল মাত্র এইশব্দটিই শিশুকে সেই (কাজ, ঘটনা) বস্তুর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ভাবে শেখা শব্দাবলীর সাহায্যে শিশু সুসংবদ্ধরূপে চিন্তা করবার ক্ষমতা লাভ করে। তাছাড়া ভাষার সাহায্যে শিশুর সমাজ জীবন সহজ হয়ে ওঠে। ভাষার সাহায্যে সে নিজের মনকে অপরের কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিতে পারে এবং অপরের কথা শুনে তার মনের পরিচয় লাভ করে। শিশুর ভাষায় অনেক রকম বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। অনেক মাতাপিতা এই সব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই শিশুকে তাঁরা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেন না। নানাভাবে তাকে তিরস্কার করেন যার ফলে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং তার ভাষার বিকাশ ব্যাঘাত পায়। যেমন—(ক) অনেক সময় দেখা যায় শিশু একই নামে একাধিক ব্যক্তিকে বা বস্তুকে অভিহিত করছে। এই সময় শিশু প্রায়ই সকল বয়স্ক পুরুষকে 'বাবা', বয়স্কা মহিলাকে 'মা' এবং সকল লম্বা বস্তুকে 'লাঠি' সম্বোধন বা বর্ণনা করে। শিশু এই সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য না ক'রে তাদের সামঞ্জস্যটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য ক'রে থাকে। (খ) অনেক সময় দুটি পুরাতন শব্দ মিশিয়ে শিশু একটি নূতন শব্দ সৃজন করে। যেমন শিশু হয়তো 'সূর্যাস্ত' কথাটা জানেনা অথচ সূর্যকে 'সুজ্‌জি ব'লে, জানে এবং লুকোচুরি খেলবার সময় কেউ দৃষ্টিপথের বাইরে গেলে 'কু-কু' শব্দ করে এটাও সে লক্ষ্য করেছে। তাই সূর্যাস্তকে (সূর্য যখন দৃষ্টিপথের বাইরে যায়) সে হয়তো একটা অভিনব নাম দিলো—'সুজ্‌জি-কু-কু'। এই নামকরণের পশ্চাতে যে অপূর্ব মননশক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেটাকে অনেকেই অনুধাবন করবার চেষ্টা

করেন না বরং শিশুর কথাটাকে অদ্ভুত বলে হেসে উড়িয়ে দেন। এর ফলে শিশুর মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রেরণাটি প্রতিহত হয়। সে কী বলতে চায় সেটা বুঝতে হবে এবং তাকে উপহাস না করে, বড়দের অভিধানে তার বক্তব্য বিষয়টাকে কি বলে, সেটা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

(গ) শিশু যখন সবে মাত্র একটা দুটো কথা বলতে শিখেছে তখন সে একটি মাত্র ক্ষুদ্র শব্দের সাহায্যে তার মনের একটি পরিপূর্ণ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে পারে। পিতা পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে বেত্রদণ্ড ধারণ ক'রে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যখন বাইরে যাচ্ছেন এমন সময় তাঁর শিশু খোকা "বাবা" বলে ডেকে উঠলো। এই "বাবা" কথাটির ভেতর দিয়ে সে হয়তো বলতে চাইলো—'বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবো', অথবা 'বাবা, তুমি যেওনা' ইত্যাদি। শিশুর সঙ্গে যাঁরা অধিকাংশ সময় যাপন করেন তাঁরাই তার অঙ্গভঙ্গি, বলার ঢং ইত্যাদি দেখে বলতে পারেন যে একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ কথা দিয়ে শিশু তার মনের কি ভাবটি প্রকাশ করতে চাইছে। শিশুর ইচ্ছা গুলিকে যথাসম্ভব সমর্থন ক'রলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। এর ফলে তার মানসিক বিকাশ উন্নততর ও সুন্দরতর হয়ে ওঠে। কিন্তু তার ইচ্ছাগুলো কী জানতে হলে, তার কথার অর্থ যথাযথ বুঝতে চেষ্টা ক'রতে হবে এবং তার জন্যে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার খুব বেশী ক'রে মেলামেশার প্রয়োজন।

তোতলামি—তার কারণ ও প্রতিকার

অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন শিশু কিছু একটা বলতে যাবার আগে ইতস্তত: করছে অথবা বার বার একটা শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে। এই আচরণের নাম তোতলামি। তোতলামিটা ভালো জিনিষ নয়, কারণ অনেক সময় এর জন্যে ব্যক্তিবিশেষকে অপরের কাছে লাঞ্ছিত হতে

হয়। অতি শৈশবেই তোতলামির উদ্ভব হয়ে থাকে এবং প্রতিকারের কোন রকম চেষ্টা না করলে এই স্বরবিকৃতি অধিক বয়স পর্যন্ত থেকে যায়। সাধারণতঃ দু-তিন বছর বয়সের সময়, পাঠশালে প্রবেশ করবার সময় এবং যৌবনোদ্গমকালে তোতলামির উৎপত্তি ঘটতে দেখা যায়। এর কারণ, উপরোক্ত সময়গুলিতে পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনে প্রবলভাবে কাজ ক'রতে থাকে এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার উদ্দেশ্যে শিশুকে রীতিমত প্রয়াস করতে হয়। দু-তিন বছর বয়সের সময় শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বীজটি সবে মাত্র অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে—পরিবেশ থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে উপলব্ধি করতে স্থরু করেছে সে। তারপর পাঠশালায় যখন সে এলো তখন তার জগতের রূপটাই গেল পাল্‌টে। নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, নতুন নতুন আসবাব-পত্র, বিচিত্র পাঠ্য বিষয় সব কিছু মিলে একটা নতুন বিশ্বের সৃষ্টি করলো তার চারপাশে। এরপর আবার যখন শিশু যৌবনের পথে পা দিতে স্থরু করে, তখন তার দেহের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অসীম পরিবর্তন ঘটে। অপরের কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবার একটা প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে সে। জীবনের এই তিনটি জটিল মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের যে বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে সময়ে সময়ে ভাষার গতি তাল রাখতে পারে না। চিন্তা এগিয়ে চলে, কথা পড়ে পিছিয়ে। তাই মাঝে মাঝে স্বরের বিকার অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই অতি সাধারণ কারণটি ছাড়াও তোতলামির আরও অনেক কারণ আছে। শিশুর চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ যদি তোতলা কথা বলেন, তাহলে শিশুও নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুকরণ করে। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা শিশুর মধ্যে অতিশয় প্রবল, কাজেই ঐরূপ অবাঞ্ছিত সঙ্গ থেকে শিশুকে দূরে রাখাই ভালো। কোন শিশু তোতলামি ক'রছে দেখে তাকে উপহাস ক'রলে, অথবা ধীরে ধীরে

কথা বলার জন্য উপদেশ দিলে কিংবা সে যে কথাটা বলতে চাইছে সেটা আর কেউ বলে দিলে ফলাফল অত্যন্ত খারাপ হয়ে থাকে। ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে, যাতে ক'রে সে বুঝতে পারে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখাবার তার কোন রকম প্রয়োজন নাই। মাতাপিতা সব সময় লক্ষ্য রাখবেন কি রকম পরিস্থিতিতে তাঁদের শিশুরা তোতলামি ক'রে থাকে। অনেকে পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই কথাবার্তায় তোতলামি সুরু করে। এরা যাতে প্রচুর বিশ্রাম উপভোগ করবার অবকাশ পায় সে রকম ব্যবস্থা করা দরকার। আবার অনেক সময় দেখা যায় বেশী ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এলে কোন কোন শিশু হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং তাদের কথার মধ্যে যথেষ্ট তোতলামি লক্ষিত হয়। এই সব শিশুর সঙ্গী সংখ্যা কমিয়ে দেওয়াই ভালো। একটি দুটি শিশুর সঙ্গেই তাদের খেলতে দেওয়া দরকার। আবার অনেক বেশী অভ্যাগতের সামনে কোন কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাতে বললেই যেসব শিশু তোতলা হয়ে ওঠে, তাদেরও অনুরূপ পরিস্থিতি থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়ঃ।

অনেক পিতামাতা শিশুসন্তানকে অন্যের কাছে শ্লোক, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়ে প্রচুর গৌরব অনুভব করেন এবং অসহায় শিশুটি নতুন পরিস্থিতিতে যদি বার বার তার কথা ভুলে যায় অথবা ইতস্ততঃ ক'রতে থাকে তাহলে তাকে ভয় দেখান। তিরস্কার ও উপহাস ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এই ধরণের আচরণের ফলে শিশুর তোতলামি ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় এবং নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা ছোট হয়ে পড়ে। তা ছাড়াও মাতাপিতার প্রতি তার মনে বেশ একটা বিরোধিতার ভাব দানা বাঁধতে থাকে। বিদ্যালয়েও তোতলা ছেলেমেয়েদের প্রতি অত্যন্ত সংযত ও সদয় ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোন-কিছু উত্তর দিতে বা কিছু মুখস্থ বলতে তাদের পীড়াপীড়ি করা

একেবারেই অনুচিত। সবচেয়ে ভালো তাদের নিয়ে একটা ভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি করা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় তাঁদের কথা বলার এই ত্রুটিটিকে মার্জিত করা। মাতাপিতার আর এক প্রকার আচরণের ফলে শিশুর কথায় তোতলামি প্রকাশ পেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, মাতাপিতা যখন কোন অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন এমন সময় শিশু যদি কোন কথা বলতে চায়, তাহলে তাকে নিরস্ত ক'রে ভদ্রতা শেখানো হয়ে থাকে। এই ভাবে প্রকাশোন্মুখ চিন্তাস্রোত স্তব্ধ হয়ে পড়লে শিশুর মনে যে আবেগরাশি সঞ্চিত হয় তার ফলে সে তোতলা হয়ে পড়তে পারে। উপরোক্ত কারণগুলি ব্যতীত শৈশবকালে মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত, হাম প্রভৃতি শারীরিক পীড়া, পূর্বপুরুষদের দোষে প্রাপ্ত কোন স্নায়ুগত বিশিষ্টতা প্রভৃতি সন্তানে বর্তানোর ফলেও তোতলামির উৎপত্তি ঘটতে পারে। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ফলে এগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিবিধান সম্ভব। তোতলামির সবচেয়ে বড়ো ওষুধ সহানুভূতি সম্পন্ন আচরণ। তোতলা শিশুকে উপহাস না ক'রে ধৈর্য্য এবং সহানুভূতি দিয়ে তার কথা শুনলে, আবেগময় সকলরকম পরিস্থিতি থেকে তাকে দূরে রাখলে সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। শিশুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলা, তার প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া এবং কথা বলতে তাকে উৎসাহিত করা সকল মাতাপিতারই একান্ত করণীয় কাজ। কারণ এই সব আচরণ নিখুঁতভাবে ভাষা-বিকাশের অনুকূল।

শিশুর বিচিত্র আবেগানুভূতি

আমাদের মনে যেমন নানারকমের আবেগ বা প্রক্ষোভ আছে; শিশুর মনেও তেমনি রাশি রাশি রাগ, দ্বেষ, আনন্দ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি নানান রকমের আবেগ আছে। জীবনকে জীবন্ত ক'রে রাখে এরা। আবেগানুভূতি না থাকলে জীবনে কোন রঙ থাকে না, রস থাকে না।

কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে এগুলির প্রয়োজন আছে যেমন, তেমনি আবার সংযমের রাশ দিয়ে এদের বেঁধে রাখতে না পারলে এরা আমাদের প্রকৃত ক্ষতিসাধনও ক'রে থাকে। সুতরাং আবেগানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে।

আমরা সচরাচর ভুলে যাই যে, আমাদের মতো শিশুদের মনেও রাশি রাশি আবেগের সঞ্চার হয়। এ ভুলের ফলে সময় সময় আমরা এমন ধরণের আচরণ করি, যার ফল শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। একটা উদাহরণ দিই। একজন ভদ্রলোক প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে আদর করেন। একদিন অফিসে ঝগড়াঝাটি ক'রে ভগ্ন মন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। আদরিণী মেয়েটি প্রতিদিনের অভ্যাস মতো তাঁর কাছে ছুটে গেলো। কিন্তু ভদ্রলোকের মনের অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি তাকে গালাগাল ক'রে দূরে সরিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু তাঁর এই অসামঞ্জস্য আচরণে শিশু-কন্যাটির মনে, কী রকম আলোড়ন হলো, কী গভীর আবেগের সৃষ্টি হলো—সে খবর তিনি পেলেন না। পিতার এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ সন্ধান ক'রতে গিয়ে মেয়েটির মনে কী রকম সংঘাতের উদ্ভব হলো তার খবরও কেউ রাখলো না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলছেন বাইরের আঘাতে শিশুর মনের ভেতর এমনি ক'রে আবেগের যে ঘূর্ণি জাগে তার নাচন সহজে থামে না। আবেগের এই ঘূর্ণিটাকে থামাতে গিয়ে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে মনোব্যাধির নানাবিধ লক্ষণ দেখা দেয়। সমাজ-জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে পাগলা গারদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর তখন তাকে জীবন যাপন ক'রতে হয়। মানব জীবনে আবেগের যখন প্রভাব এতো, তখন সকল মাতাপিতারই শিশুমনের বিচিত্র আবেগরাশির কথা জানা দরকার। কী ভাবে শিশুমনের আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়, সে

কৌশলটাও তাঁদের শিখে নিতে হবে। পরের আলোচনা থেকে এবিষয়ে কী করা দরকার সে সম্বন্ধে তাঁরা একটা ধারণা লাভ ক'রতে পারবেন বলেই মনে হয়।

শিশুর ভয়

(ক) **আকস্মিক বিপুল পরিবর্তনে** শিশুরা ভয় পায়। যদি হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হয় কিংবা বিপুল বেগে কোন কিছু নড়ে চড়ে ওঠে তাহলে শিশুর মনে ভীতির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই সব কারণে শিশুরা বাজের শব্দকে এবং কুকুর, বানর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারকে ভয় পায়। শিশু কুকুরকে ভয় করে তার কারণ এই জানোয়ারটির আকস্মিক লম্ফঝম্ফ ও অত্যাচ্চ চীৎকার। শিশুর মন থেকে কুকুর-ভীতি দূর ক'রতে হলে তাকে নানা রকমের মজার মজার কুকুরের গল্প বলে শোনাতে হবে। বিশেষ ক'রে জন্তুটির অপরিসীম প্রভুভক্তির কথা বেশী ক'রে জানাতে হবে তাকে। বাড়িতে কুকুর-শাবক নিয়ে এসে শিশুর খেলার সঙ্গী ক'রে দিতে হবে। শিশু যদি দেখে তার বাবা এবং মা কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন তাহলে সেও নির্ভয়ে জানোয়ারটার কাছে এগিয়ে যাবে এবং তাকে নিয়ে খেলা ক'রবে।

একবার দেখা গেলো একটি শিশু গভীর জল দেখলেই ভয় পায়। কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেলো সে একদিন চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলো। এই ব্যাপারটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কেউ তাকে ধীরে ধীরে চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গিয়ে হাত ধরে জলে নামিয়ে তার ভয় ভাঙ্গিয়ে দেয়নি। তাই সে ভয়টি থেকে গিয়েছে। আর একটি শিশু নিরীহ খরগোসকে ভয় ক'রতো; তার কারণ সে যখন প্রথম প্রথম খরগোসটাকে ধরতে গিয়েছিলো সে সময়ে তার পার্শ্বচর একটা বিরাট রকম শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। এই আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দটাই খোকার মনে নিরীহ জন্তুটির প্রতি ভয়ের সঞ্চার করেছিলো।

শিশুটিকে ভালো খাবার দিয়ে, আস্তে আস্তে খরগোসটাকে তার কাছাকাছি নিয়ে এসে তার মন থেকে খরগোসভীতি দূর করাও সম্ভব হয়েছিলো।

আমাদের অনেক কিছু ভীতির মূলে আছে এই ধরণের ছোটখাটো অভিজ্ঞতা। আপনার খোকাটি হয়তো অন্ধকারকে খুব ভয় করে। তলিয়ে দেখুন কারণটা কী। হয়তো দেখবেন এই ভয়টা আপনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। অনেক দিন আগে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আপনি হয়তো তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন অন্ধকার ছাদে জুজুবুড়ি আছে অথবা সে যেই ঘুমিয়েছে অমনি আপনি বাতি নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চীৎকার ক'রে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন ; সেই বিরাট শব্দে খোকার ঘুম ভেঙে গেলো। সে চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লো অন্ধকার। সেদিন থেকেই অন্ধকারকে সে ভয় করতে শিখেছে অথচ আপনি সেটা লক্ষ্যই করেননি মনস্তাত্ত্বিকের কাছে এলে আপনার খোকার ভয় ভাঙানোর জন্য তিনি হয়তো নানারকম উপদেশ দেবেন। বলবেন, খোকা যখন অন্ধকারে থাকবে মা যেন তার পাশে থাকেন। নানারকম সুন্দর সুন্দর গল্প বলে ছড়া কেটে, গান গেয়ে অন্ধকার হতে তার মনকে অন্য দিকে আকর্ষণ করেন। অথবা খোকা যে ঘরে শোবে সে ঘরে বাতি জ্বলবে ঠিকই ! কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বাতিটা কমিয়ে দিতে হবে। একটু একটু করে বাতিটা একদিন সত্যি সত্যি নিবে যাবে অথচ খোকা সেটা টেরই পাবে না। খুব সহজ ব্যাপার হলেও অনেক মাতাপিতাই ছেলে মেয়েদের ভয় ভাঙানোর এই অতি সহজ উপায়গুলো জানেন না।

(খ) **অনুকরণ সঞ্জাত ভীতি**—অনেক সময় শিশুরা মাতাপিতা এবং তার চারপাশে অন্য যারা থাকে তাদের অনুকরণ ক'রে অনেক জিনিষকে ভয় ক'রতে শেখে। যার মা-বাবা ঝড়বাদলা, বজ্রবিদ্যুৎ

ইত্যাদিকে ভয় করেন, সে শিশুও এই সব সামগ্রীকে ভয় ক'রতে শেখে। আরশুলা, মাকড়সা, প্রভৃতি নিরীহ কীটপতঙ্গের প্রতি ভীতিও এইভাবে শিশু মনে শেকড় গেড়ে বসে। এই সব ভীতি শিশুমন থেকে অপসরণ করবার আগে বয়স্কদের নিজের মন থেকে সেগুলি তাড়াতে হবে। অনেক সময়ে পরিবারের মধ্যে নানারকম ভয়ের কাহিনী আলোচনার ফলে শিশুর মনে নানারকম ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকে। স্ুতরাং এই ধরণের আলোচনা শিশুর সম্মুখে না করাই শ্রেয়ঃ।

(গ) **অন্য ধরণের ভীতি**—অধিকাংশ মাতাপিতাই কামনা করেন তাঁদের ছেলে মেয়ে অন্য সকল ছেলে মেয়ের সেরা হোক। তাঁদের এই কামনাকে সফল করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শিশু সন্তানের সম্মুখে নিজেদের অভিপ্রেত অতি উচ্চ একটি আদর্শস্থাপন করেন। কিন্তু এমন হতে পারে যে তাঁদের এই আদর্শকে সফল ক'রে তুলবার শক্তি শিশুর নেই। যেদিক দিয়ে উন্নতি করবার তার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেটা হয়তো সম্পূর্ণ আর একটা দিক। কিন্তু মাতাপিতাকে খুশী করতে গিয়ে শিশু যতই ব্যর্থ হতে থাকে ততই তার মধ্যে এক প্রকার ভীতির সঞ্চার হয়। নূতন নূতন পরিবেশের সম্মুখীন হতে হলেই তার দেহ শিহরিত হয়, মন সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই ভয়টা আরও প্রকট হয় তখনই, যখন মাতাপিতা তার ব্যর্থতার জন্য নানাভাবে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এর ফলে শুধু যে ভয়টাই বেশী হয় তা নয়, শিশুর নৈতিক চরিত্রেরও যথেষ্ট অধঃপতন ঘটে।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার। জনৈক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসবার আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। মজার ব্যাপার এই যে, তিনি অঙ্কে সুপণ্ডিত হলে কী হবে, তাঁর একমাত্র পুত্রটির অঙ্কে ভালো মাথা ছিলো না। তাঁর ধারণা তাঁর পুত্র যদি অঙ্কে কাঁচা হয় তাহলে তাঁরই গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে। এই ধারণার

বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। অঙ্ক কষতে ভুল করলেই শিশুটির ভাগ্যে জুটতো লাঞ্ছনা আর তিরস্কার। ফলে শিশুটি তার পিতাকে অত্যন্ত ভয় ক'রতে সুরু করে এবং যথাসম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলতে শেখে। একদিন নতুন শিক্ষক এলেন তাকে পড়াতে। পড়বার ঘরে তার বাবাও বসে বসে নিজের কাজ করছিলেন আর ছেলের পড়ায় নজর রাখছিলেন। শিক্ষক মশাই একটা অঙ্ক কষতে দিলেন শিশুটিকে। খাতার একটা পাতা বার দুই উল্টোবার পর শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে শিশুটি একটি পেনসিল আনবার নাম ক'রে তার বইয়ের আলমারীর কাছে উঠে গেলো। সেখানে কিন্তু পেনসিল না খুঁজে সে আর একটা খাতা উল্টে কী যেন দেখে নিলো। তারপর পড়ার টেবিলে বসে অঙ্কটা কষে মাষ্টার মশাইকে দেখতে দিলো। গোড়া থেকেই আমি তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এবার উঠে গিয়ে আলমারী থেকে সেই খাতাটা নিয়ে এলাম যেটা সে একটু আগেই দেখে এসেছিলো। দেখলাম মাষ্টার মশাই যে অঙ্কটা তাকে কষতে দিয়েছিলেন সেটা সেখানে কষে দেওয়া আছে। সেই অঙ্কটাই তাকে তারপর কষতে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে সফল হয়নি। এই শিশুটির কোমল মনে চুরি ক'রে কৃতিত্ব নেবার এই যে একটা প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে এটা কী তার পিতাই সৃষ্টি করেননি? তাঁকে খুশী ক'রে তাঁর তিরস্কার এবং শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার অভিপ্রায়েই তো আজ সে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এমনিভাবে বাপমার হাতেই কতো যে কোমলমতি শিশুর নৈতিক অবনতি ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই।

নিজের কাজ হাসিল করার জন্য অনেক মা শিশুকে অযথা ভয় দেখান—জুজুর ভয়, বুড়োর ভয় ইত্যাদি। হয়তো সাময়িকভাবে এতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়, ভয় পেয়ে শিশু তার ওজর আব্দার ত্যাগ

করে। কিন্তু এর ফলে নানা রকম অযথা ভয় তাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন ক'রে থাকে।

শিশুর ভয়কে কখনও উপহাস করা ভালো নয়। তার ভয় যদি কাল্পনিক হয় তবুও না। মার কাছে যে শিশুটি শুনেছে যে, একটা খু-উ-ব বড়ো ঝুরি নামানো অন্ধকার বটগাছের ভেতর একটা ডাইনীবুড়ী বাস করতো, সে হয়তো একথা শোনার পর, তাদের গাঁয়ের পুকুর পারে যে পুরাণো বট-টা আছে, সেটাকে একটা অদৃশ্য ডাইনীর আস্তানা বলে ধরে নিয়েছে। ভুলেও সে ওপাশ দিয়ে মাড়ায় না। মা যদি তার এই ভয়টার খবর পেয়ে এ নিয়ে হাসি তামাসা করেন অথবা রাশি রাশি যুক্তির অবতারণা ক'রে তার ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করেন তাহলে ঠিক বিপরীত হবে। কিন্তু তিনি যদি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরপারে বটতলায় যান এবং চারিপাশে ঘুরে ফিরে তাকে দেখিয়ে দেন যে ডাইনী-বুড়ীর নামগন্ধও সেখানে নেই, তাহলে তার ভয়টা ভেঙে যাবে। উপদেশের চাইতে উদাহরণই যে এসব ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী সে কথাটা মাতা-পিতাকে মনে রাখতে হবে সব সময়ই।

রূপকথা ও শিশুমন

কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে শিশুদের কাছে ডাইনীবুড়ী, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব ইত্যাদির বিষয়ে কাহিনী বলা ঠিক কী না? আমাদের দেশে এবং সকল দেশেই এমন অজস্র রূপকথা লোক সমাজে প্রচলিত আছে যাদের মধ্যে এই সব ভয়াবহ প্রাণীর ছড়াছড়ির অন্ত নাই। ঠাকুরমা-দিদিমারা চিরকালই খোকাখুকুদের এইসব অপরূপ রূপকথা শুনিয়ে এসেছেন। লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যাবে রূপকথার রাজপুত্তুর সব সময়ই ডাইনীর চোখে ধূলো দিয়েছে। রাক্ষসরাক্ষুসীর মাথা কেটেছে এবং ভীষণ যুদ্ধে দৈত্য-দানবকে পরাস্ত ক'রে বন্দিনী রাজনন্দিনীকে

উদ্ধার ক'রে এনেছে। বলা বাহুল্য বলার ভঙ্গিতে এই সব গল্প-কাহিনী শিশু মনে অসীম সাহসের সঞ্চার করে। তার মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মায় যে সেও রাজপুত্রের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়েও বিজয়মাল্য অর্জন ক'রে আনবে। এইসব রূপকথা শিশুর কল্পনাকে প্রখর করে। তার মনে অনন্ত সাহসের সঞ্চার করে।

শিশুর রোষ

যে শিশু রাগ করতে জানে না, সুবোধ শিশুর মতো সব সময়ই অন্যের কথা মেনে চলে বুঝতে হবে তার মানসিক বিকাশ ঠিকমত সম্পাদিত হয় নি। এ দুনিয়ায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না। অনেক সময় রাগ দেখাবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু রাগ করবার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি রাগের মাত্রা বেশী হয়ে গেলে কিংবা অকারণে দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যেরই প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। তাই এ বিষয়ে সংযম শিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ শিশুরা রুষ্ট হয় তখনই, যখন তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ও অঙ্গসঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যে ছোট্ট মেয়েটি পুতুল খেলায় ব্যস্ত হয়ে আছে, তাকে যদি তার মা খাবার খেতে পীড়াপীড়ি করেন, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যদি খেলা থেকে তুলে নিয়ে যান, তবে সে নিশ্চয়ই রাগ ক'রবে। হয় ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি ক'রবে, না হয় মুখ গুমরে চুপ ক'রে বসে থাকবে। কারও সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। ডাকলে শুনবে না। একটি ছোট্ট খোকা বাগানের বাঁশতলায় বসে একদিন শুকনো বালি দিয়ে ঘর তৈরী ক'রতে চেষ্টা করছিল। বালির ওপর বালি কিছুতেই এঁটে বসছিল না। তাই ঘরও আর উঠছিল না। বার বার চেষ্টার ফলেও যখন খোকা ব্যর্থ হলো, তখন দেখা গেল রেগেমেগে সে খেলার

উপকরণ গুলোকে ছুঁড়ে ফেলছে। তার ফুলের মত সুন্দর কচি মুখটি উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। এমনিভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশুর রাগের পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে তার প্রতিহত ইচ্ছারাশি।

ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়লেও শিশুরা অনেক সময় রেগে ওঠে। সময় মত যদি তাদের খাবার দেওয়া হয় এবং ঘুমোবার প্রচুর অবকাশ দেওয়া যায়, তাহলে তারা অকারণ রাগ প্রকাশ করবার প্রয়োজন বোধ করবে না। যে সমস্ত ছেলেমেয়েকে শৈশবে নিয়মিত খাবার এবং বিশ্রাম দেওয়া হয়নি বড় হলে তাদের মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে। নিয়মিত খাবার এবং নিদ্রার আয়োজন করা ছাড়া মাতাপিতা শিশুকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন যাতে তারা তাদের ইচ্ছাপূর্তির পথে যে সব বাধা সেগুলিকে অতিক্রম করতে পারে। ওপরে যে শিশুটির কথা বলা হয়েছে সে যখন বার বার চেষ্টা করেও বালির ঘর তৈরী করতে পারছিল না তখন যদি ভেজা মাটি দিয়ে ঘর তৈরীর কাজে তাকে সাহায্য করা হতো তাহলে তার রাগ করবার কোন কারণই ঘটত না।

শিশু যাতে রাগান্বিত না হয় এতক্ষণ সেই কথাই বলা হলো। কিন্তু যখন সে সত্যি সত্যি রেগে ওঠে তখন তার প্রতি কি রকম আচরণ করা উচিৎ, সেটাও মাতাপিতার জানা দরকার। সকলেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন শিশু রেগে উঠলে তার প্রতি যদি মনোযোগ দেওয়া যায় তাহলে তার রাগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। মা যখন তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন তখন তার কান্নার ঘটা ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পারলে শিশু নিজেকে খুব বেশী মূল্য দিয়ে ফেলে, এবং নিজের জিদ্ জাহির করার উদ্দেশ্যে কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। এক্ষেত্রে শিশুর রোষকে উপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি। শিশু রাগ ক'রলে মাতাপিতাও যদি রেগে

ওঠেন তাহলে তার ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এতে শিশু আরও বেশী রেগে উঠবে। যদি তাঁরা শিশুকে তার রাগের জন্য বকাবকি সুরু করেন অথবা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন তাহলে শিশু বুঝবে তাঁরা নিতান্তই অক্ষম। সব চেয়ে ভাল, শিশু যখন রেগে ওঠে, তার রাগটাকে উপেক্ষা ক'রে চলা এবং সম্ভব হলে তার সম্মুখ থেকে স'রে যাওয়া। তাহলে শিশু তার রাগটাকে নিরর্থক মনে করবে এবং ধীরে ধীরে তার আবেগ প্রশমিত হয়ে আসবে। অনেকেই রুষ্ট শিশুকে বন্ধ ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখেন। এ রকম শাস্তিবিধানের ফল হয় খুব খারাপ। শিশুর মনে বন্ধ ঘরের প্রতি একটা অস্বাভাবিক ভীতির সৃষ্টি হতে পারে এবং মাতাপিতার বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পূর্বেই বলেছি দু-তিন বছর বয়সের সময় সাধারণতঃ সকল শিশুর মধ্যেই ঋণাত্মক অর্থাৎ 'না' বলার মনোভাব দেখা যায়। এ সময় তাদের এটা করো, ওটা করো, সেটা ক'রোনা ইত্যাদি ধরণের আদেশ উপদেশ দিয়ে বিব্রত ক'রে তুললে তারা অবশ্যই রুষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ প্রায় সব কিছুতেই 'না' বলার প্রেরণা তাদের মধ্যে তখন অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই প্রেরণা ব্যাহত হলেই তাদের মনে রোষের সঞ্চার হয়। জোর ক'রে যদি শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহলে সে খিট্‌খিটে, একগুঁয়ে অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং যাঁরা তার স্বাধীনতায় বাধা দান করেন তাঁদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা ক'রতে শেখে। সুতরাং শিশুর কাজে কর্মে অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি না ক'রে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু এ কথাটা সকলকে মনে রাখতে হবে যে, সকল রকম আবেগময় পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখলে, ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত হয়ে সে গড়ে উঠবে না। সংসারে অনেক রকম আবেগময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে একদিন হতেই হবে, সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে সে যাতে সফলতা অর্জন ক'রতে পারে সেই মত শিক্ষাও তাকে দেওয়া দরকার।

ছোটদের আঙ্গুল চোষা

লক্ষ্য করলেই সকলেই দেখতে পাবেন প্রায় সকল শিশুই এক বছর বয়সের মধ্যে যখন-তখন নিজের হাতের বুড়ো আঙ্গুল চুষে থাকে। ক্ষুধিত শিশু যখন মার স্তন পান করে, তখন তার ঠোঁট দুটিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার ফলে সে অতিশয় আনন্দের আস্বাদ পায়। তাই ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেও সে মাতৃস্তন্যপানে নিরস্ত হয় না। কিন্তু মা সব সময়ই শিশুর কাছে থাকতে পারেন না, তাঁর আরও অনেক কাজ থাকে, তাই শিশু মাতৃস্তনের পরিবর্তে তার নিজের আঙ্গুল চুষে ওষ্ঠসঞ্জাত আনন্দের আস্বাদন ক'রে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেশী বয়সের শিশুরা এবং বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ আঙ্গুল চোষা অথবা দাঁত দিয়ে নখ খোঁটার অভ্যাস থেকে মুক্তি পাননি। এই সমস্ত ব্যক্তি যখন বহির্জগতে কোন বাধার সম্মুখীন হন অথবা কোন আবেগময় পরিস্থিতিতে পতিত হন তখন শিশুসুলভ উপায়ে অর্থাৎ আঙ্গুলি শোষণ ক'রে অথবা দাঁত দিয়ে নখ খুঁটে নিজের অজ্ঞাতে আনন্দের সন্ধান করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাঁদের এই অভ্যাস নিয়ে হাসি তামাসা করলে বা উপদেশ-বৃষ্টি করলে কোন লাভ হবে না। উত্তেজনাময় পরিবেশ থেকে তাঁদের দূরে রাখা এবং প্রফুল্ল রাখা, অবসাদ ক্লান্তি ক্ষুধা প্রভৃতি অনুভূতিগুলি যেন পীড়াপ্রদ হয়ে ওঠার সময় না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শাসন তিরস্কার প্রভৃতি হতে তাঁদের নিষ্কৃতি দান করা এবং শিশুদে মজার মজার খেলা ও কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত ক'রে রাখাতে খুব বেশ সুফল ফলবে। উৎসাহ ও প্রশংসা বেশী কার্যকরী হবে।

খেলাধুলা

খেলাধূলার প্রতি শিশুর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রীতি আছে শিশুরা খেলাধূলা ছাড়া থাকতে পারেনা। নানা প্রকার খেলার ভিত

দিয়ে তারা প্রচুর আনন্দ আস্বাদন করে এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই খেলার সাহায্যে তাদের দেহ ও মন সুগঠিত হয়ে ওঠে। নানাবিধ অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে তাদের পেশী এবং স্নায়ুগুলি পুষ্টিলাভ করে। তারা নানাভাবে হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে ব্যবহার করবার ক্ষমতা অর্জন করে। চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি রীতিমত ব্যবহার করার ফলে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন রঙ, রূপ, গন্ধ, রস প্রভৃতির অভিজ্ঞতা হয়। বস্তুর দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ভাবে ধারণা জন্মায়। দিক, দূরত্ব প্রভৃতির অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্মুক্ত মাঠ প্রচুর সূর্যালোক ও পর্যাপ্ত বাতাসের মধ্যে খেলাধূলো করার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। মনের প্রফুল্লতা বাড়ে। শিশুদের নানারকম আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা খেলার মধ্যে চরিতার্থ হয়। তাদের কল্পনা খেলার ভেতর রূপলাভ করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদের কৌতূহলও যেমন মেটে তেমনি আবার তাদের অনুকরণ করার ইচ্ছাবৃত্তি সাধন করারও সুযোগ যথেষ্ট ঘটে। এক সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার জন্য তাদের মধ্যে সমাজ-চেতনার সঞ্চার হয়। একজন অপরজনের কথা ভাবতে শেখে এবং দলের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করবার শিক্ষালাভ করে। এক কথায় খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ এবং মনের বিকাশ সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত হয়ে সে গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর খেলাধূলার প্রতি প্রত্যেক মাতাপিতারই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশুর বয়সোপযোগী খেলাধূলায় আয়োজন করা এবং খেলা করতে শিশুকে উৎসাহিত করা সকল অভিভাবকেরই নিতান্ত করণীয় কাজ।

এক বছরের ছোট যে সব শিশু, তারা সাধারণতঃ হাতপা ছুঁড়ে, মাথা ঘুরিয়ে, চোখ কান ফিরিয়ে খেলা করে। আগেই বলেছি তাদের ওপর একরাশ জামা কাপড় চাপিয়ে তাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অঙ্গ সঞ্চালনে বাধার

সৃষ্টি করা একেবারেই সমীচীন নয়। প্রায় এক বছরের সময়, শিশুরা যখন হামাগুড়ি দিতে এবং হাঁটতে শেখে তখন এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকা তাদের পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরা যাতে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারে সে জন্য কোন একটা ঘর অথবা কোন একটা নিরাপদ অথচ উন্মুক্ত জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এবং নানান রকমের হাল্‌কা ছোটখাটো সামগ্রী (যেমন চুষি, কাগজের ফুল, কমলালেবু, কৌটা, ডিবা ইত্যাদি) তার চারপাশে ছড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে ক'রে সে তার চোখ, কাণ, হাত পা ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারে। বছর দুই বয়সে হ'লে শিশুর জন্য নানারকমের খেলনা এনে দিতে হবে এবং সেগুলি রাখার জন্য একটি নির্দিষ্টজায়গা দিতে হবে তাকে। সে যেন ইচ্ছে করলে খেলনাগুলো ব্যবহার করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এরপর ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডী যখন শিশু মনকে বেঁধে রাখতে পারবে না তখন গৃহ-সংলগ্ন অঙ্গণে বা উদ্যানে তার খেলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই সব খেলার প্রাঙ্গনে বা মাঠে সূর্যের আলোক, মুক্ত বাতাস এবং গাছের স্নিগ্ধ ছায়া যদি থাকে, তাহলে শিশুর স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করবার সুযোগ পাবে। সুতরাং যতদূর সম্ভব শিশুর ক্রীড়াভূমিতে আলো, ছায়া, আর বাতাসের আয়োজন করা দরকার। শিশু যতো বড়ো হবে ততো তার খেলার ধরণ যাবে পাল্‌টে। যে শিশুটি একদিন হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দ পেতো সে আজ দৌড়াদৌড়ি ক'রতে লাফঝাঁপ দিতে, দোলায় দুলতে, ঘাসের ওপর ডিগবাজি খেতে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মাটির ওপর পিছলে পড়তে ভালোবাসে। আরও যারা বড়ো তারা ঘুড়ি ওড়াতে, তিনচাকা সাইকেল চড়ে ছুটে বেড়াতে, লুকোচুরি খেলতে, গাছে চড়তে বেশী ভালোবাসে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের যতো পুষ্টি ঘটে খেলাধূলার জটিলতাও ততো বেড়ে যায়। যারা ছোট তারা খেলা-ধূলায় স্বাধীনতাটা বেশী পছন্দ করে অর্থাৎ খেলার ভেতর কোন রকম

কড়া নিয়ম মেনে চলতে তারা একেবারেই রাজী নয়। কিন্তু যারা বড়ো তারা খেলার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ধারা মেনে চলতে উৎসুক। সুতরাং কোন শিশুর খেলাধূলার ধরণ কী রকম হবে, সেটা নির্ভর করছে তাদের বঁয়সের ওপর। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, বয়েসটাই এক্ষেত্রে সব নয়। দেহ এবং মনের পুষ্টি কী রকম, প্রধানতঃ তারই ওপর নির্ভর করে, একটি বিশেষ শিশুর কী ধরণের খেলাধূলার প্রয়োজন। বয়সে ছোট হলেও তার মনের বিকাশ খুব উন্নত ধরণের হতে পারে, আবার দেহের খুব পুষ্টি হলে মনেরও যে তেমনি পুষ্টি হবে সে কথাও ঠিক নয়। শিশুকে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করলে এবং মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে মাতাপিতা তাঁদের শিশুর দেহমনের কী রকম পুষ্টি সাধিত হয়েছে সেটা বুঝতে পারবেন।

শিশুরা বড়োদের যা করতে দেখে নিজেরা খেলাধূলার ভেতর সেই সব ক'রে থাকে। পুতুল খেলার ভেতর দিয়ে শিশুর মা, বাবা, দাদা, বৌদি ইত্যাদি চরিত্রের অভিনয় করে। তার নিজের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে খেলার ভেতর দিয়ে। কোন বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে শিশু তার পুতুলের বিয়ে দিতে বসে। বয়স যতো বাড়তে থাকে শিশুর খেলায় কল্পনারস্থান ততো বেশী হয়। বেদুইনের গল্প শুনে একটা লাঠির গোছাকে উট খাড়া ক'রে সে কল্পিত মরুভূমি অতিক্রম ক'রে যায়। কাগজ কেটে নানা রকমের ফুল, ফল, পাতা, পাখি জন্তুজানোয়ার সৃষ্টি করে। তাদের এই সব কল্পনাকে বিকশিত ক'রে তোলার চেষ্টা সকল মাতাপিতারই করা দরকার। নানান রকমের রঙীন কাগজ, রঙ, তুলি প্রভৃতি ছবি আঁকার উপকরণ, ভোঁতা কাঁচি, ছুরি, নরম মাটি, নানান আকারের কাঠের টুক্‌রো প্রভৃতি অতি সহজলভ্য সামগ্রীগুলি শিশুদের যদি দেওয়া হয় তাহলে ছবি এঁকে,

নক্সা ক'রে, পুতুল গড়ে, ফুল কেটে ইচ্ছে মতো তারা নিজের নিজের কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে সক্ষম হবে।

খেলার সঙ্গী

অনেক মাতাপিতা আপন শিশুকে অন্য কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলাধূলা করতে দেন না। তাঁদের ভয় পাছে সে মন্দ হয়ে যায়। তাই তাঁরা তাঁদের স্নেহ-আঁচলের আড়ালে শিশুটিকে অন্য সবার থেকে আগলে রাখতে চান। এর ফলে শিশুর মনে সমাজ-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারে না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করবার, নতুন পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার কোন দিনই হয় না। সে আত্ম-কেন্দ্রিক, অভিমানী, এবং ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। নিজের সুখ দুঃখ নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকে, অতি সহজে ভেঙে পড়ে এবং বাস্তব জগত হতে বিদায় নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। কল্পনাপ্রিয়তা অতিমাত্রায় বেড়ে উঠলে তার মধ্যে নানারকম মানসিক ব্যাধিরও উৎপত্তি ঘটতে পারে। সুতরাং আপন আপন শিশুকে আর পাঁচজন শিশুর সঙ্গে মিলে মিশে খেলা করতে উৎসাহিত করা সকল মাতাপিতারই কর্তব্য। অন্যথায় তাঁরা নিজের হাতেই নিজের স্নেহ পুত্তলিটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলবেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর সঙ্গী নির্বাচন করা খুব সোজা কাজ নয়। যে সব শিশুর দেহ এবং মনের পুষ্টি প্রায় একই রকম, অর্থাৎ সাধারণতঃ যাদের মধ্যে বয়সের তারতম্য খুব নাই তারা যদি একসঙ্গে খেলাধূলা করবার সুযোগ পায় তাহলে অত্যন্ত আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়। সঙ্গীদের বয়েস যদি খুব বেশী হয় তাহলে খেলার প্রকৃতিটা অন্য রকম হবে। তার ফলে শিশুর দেহ ও মনের ওপর চাপ পড়বে খুব বেশী। তাছাড়া বড়রা সব সময়ই তার ওপর কর্তৃত্ব করার ফলে শিশুর আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি ব্যাহত হবে,

তার মধ্যে স্বাধীন ভাবে কাজ করবার এবং চিন্তা করবার শক্তি জাগবে না। পক্ষান্তরে তার সঙ্গীরা যদি তার চাইতে খুব বেশী ছোট হয় তা হলে সে আত্মশক্তিতে অতি মাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে সকল ক্ষেত্রেই প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে—বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে না। সুতরাং শিশুর সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে খুব সতর্কতা সহকারে। খেলার মাঠে সঙ্গীদের মধ্যে যদি ঝগড়াঝাটি হয় তাহলে অভিভাবক যেন কোন একটি বিশেষ শিশুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করেন। অনেক সময় সমস্ত ঘটনাটা না জেনেই মাতাপিতা তাঁদের নিজের শিশুর পক্ষ নিয়ে অন্য শিশুদের তাড়না করেন। শিশু-মনে এর রীতিমত প্রতিক্রিয়া হয়। শিশু তার মাতাপিতাকে ভালোমন্দ সকল কাজেই তার সমর্থক বলে ভাবতে শেখে এবং তার মধ্যে নীতিজ্ঞান ঠিকমতো বিকাশলাভ করেনা। ঝগড়াঝাটির যথার্থ কারণ নির্ণয় ক'রে সেটিকে দূর করবার চেষ্টাই করতে হবে।

অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে শিশুর খেলা করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আবার একা একা খেলা করারও তার দরকার আছে। নির্জন-তাকে ভালোবাসতে না শিখলে একাগ্রতা শিক্ষা হয় না। একাগ্রতার অভাব ঘটলে কাব্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন প্রতিদিন কিছুক্ষণ একাকী থাকতে শেখে। ভালো ভালো গল্পের বই, ছবির বই পড়তে দিলে, গান গাওয়া শেখালে, ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারলে শিশু এই সব দিয়ে তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে কাজে আর আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে। তার কল্পনাশক্তি প্রখর হবে। একাগ্রতার গভীরতা বাড়বে। সৃষ্টি করবার মতো মানসিক শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠবে সে। সুতরাং শিশুকে নিঃসঙ্গ অবকাশ দেবার আয়োজন করতে হবে সকলকে।

শিশুর শেখা

শিক্ষার অন্ত নাই। মানুষ জন্ম মুহূর্ত থেকে স্বরু ক'রে মৃত্যুবরণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু শৈশব সময়ে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে থাকে তার বিচিত্রতা এবং দ্রুততা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। যে শিশুটি কিছুকাল আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন-রাত্রি কাটাতো, সে ক্রমেক্রমে বসতে, হামাগুড়ি দিতে, হাঁটতে, হাত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী ধরতে, জামার বোতাম লাগাতে, কথা বলতে, খেলা করতে শিখেছে। প্রতিমুহূর্তে সে নতুন নতুন কার্যকলাপ সম্পাদন করবার ক্ষমতা ও কৌশল আয়ত্ত করেছে। এই সব কাজ আজ আমাদের কাছে অতি সহজ মনে হলেও এগুলি আয়ত্ত করা এত সহজ ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল দেহ এবং মনের অত্যন্ত জটিল পরিপুষ্টির। স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ না ঘটলে এগুলো কখনই সম্ভব হতো না। স্বতরাং শিশুকে কোন কিছু শিক্ষা দেবার আগে লক্ষ্য করতে হবে যে, তার দেহ মন এই বিশেষ কাজটি সম্পাদন করবার উপযোগী কি না সেদিকে। মলাশয় ও মূত্রাশয়কে যে সব স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত করে, সেগুলির যথারীতি পুষ্টিসাধনের আগেই যদি শিশুকে মলমূত্র নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে এই শিক্ষালাভ করতে সে সফল হবে না এবং নতুন কিছু আয়ত্ত করার আগ্রহ তার কমে যাবে। তেমনি দু-তিন বছরের শিশুকে যদি অনেকক্ষণ এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সে কখনই কৃতকার্য হবে না; তার কারণ, তার দেহের মধ্যে অহরহ যে সব পরিবর্তন ঘটছে সেগুলি স্বভাবতঃই তাকে চঞ্চল ক'রে রাখে, চুপ ক'রে বসতে দেয় না। আবার যে শিশুর অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করার মত দেহ এবং মনের বিকাশ ঘটেছে তাকে যদি ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রকৃতিকে পীড়ন করা হবে এবং তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কোন কাজ ঠিক মত শিক্ষা ক'রতে হলে বার বার সেটি সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু কাজটি যদি আনন্দদায়ক না হয়ে যদি পীড়াদায়ক হয় তাহলে শিশু পুনরায় সেটি সম্পাদন করতে চাইবে না। সুতরাং কোন একটি কাজ শিশুকে শেখাতে হলে কাজটিকে মজার ক'রে তুলতে হবে। যে শিশুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাগ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাকে যদি সেই সময় বিছানায় শুইয়ে একটি সুন্দর গল্প অথবা মিষ্টি গান শোনানো হয় তাহলে সে উৎসাহিত হয়ে প্রতিদিন গল্প এবং গানের লোভে যথাসময়ে শুতে যাবে। নিজের হাতে খাবার খেতে যখন শেখানো হবে, তখন যদি শিশুকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয় অর্থাৎ সে যদি হাত দিয়ে চামচ, বাটি, গ্লাশ ইত্যাদি ব্যবহার করবার সুযোগ পায় তাহলে নিজের কৃতিত্বে আনন্দিত হয়ে উঠবে। তার স্বাধীনভাবে চলার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং অতি সহজেই কাজটা শিখে ফেলবে সে। যে কোন অভ্যাস তৈরী ক'রতে হলে তার সঙ্গে আনন্দের আয়োজন করা এবং দুঃখ বা পীড়াদায়ক কোন রকম অভিজ্ঞতা যেন কাজটি সম্পাদন করার সময় ঘটতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। কিন্তু কোন একটা বিশেষ কাজ বার বার করার জন্য শিশুকে প্রায়ই খুব বেশী পীড়াপীড়ি করা হয় এবং তার কাজের নির্মম সমালোচনা করা হয়; যেমন, তুমি কি গ্লাশটা এইভাবে ধরতে পারো না, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছুই হবে না দেখছি, ইত্যাদি তাহলে কাজটির ওপর শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মাবে। তার সকল আগ্রহ উবে যাবে। অতএব এই সব বিষয়ে অতিশয় সতর্কতার আবশ্যক। শিশুর পক্ষে কাজটি যাতে সহজসাধ্য হয় সেদিকেও খুব বেশী দৃষ্টি দিতে হবে। যে শিশুটিকে নিজে নিজে জামা কাপড় পরা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার জামাকাপড়গুলো যদি খুব হাল্‌কা হয় এবং সেগুলো পরিধান করা যদি তার পক্ষে সহজ হয় তাহলে অনায়াসেই এ কাজটা সে করতে পারবে।

আদেশ অপেক্ষা উপরোধ ও উপদেশ শিশুকে ভাল কিছু শিখবার জন্য অধিক সাহায্য করে। ভয় দেখিয়ে বা শাস্তি দিয়ে শিশুকে কিছু শেখানো যায় না। তার ভুলের জন্য তাকে তিরস্কার না ক'রে তার ভাল করার জন্য তাকে প্রশংসা করায় বেশী কাজ হয়। অর্থাৎ তার দোষটাকে বড় ক'রে না দেখে তার গুণটাকে বড় ক'রে দেখলে ফল হয় ভাল। শিশুকে কোন কিছু করার জন্য শাস্তি দিলে সে একগুঁয়ে হয়ে ওঠে এবং যেটা ক'রতে তাকে বারণ করা হয় সেইদিকে তার আগ্রহ বেড়ে ওঠে। সুতরাং শাসনের অপেক্ষা সোহাগই শ্রেয়ঃ। শিশুকে কোন কিছু শেখাতে যাঁরা যাবেন তাঁদের এইসব মূল্যবান কথাগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

শিশুর কৌতুহল

শিশুর যতো বয়সে বেড়ে ওঠে, ততো তার বুদ্ধি ওঠে বেড়ে। সে তাই তার চারপাশের বিশ্ব-জগত সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অজস্র প্রশ্ন তার মনের ভেতর ভিড় ক'রে আসে। তার চারপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদের সহস্র সহস্র প্রশ্ন ক'রে সে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। তার অধিকাংশ প্রশ্নই বড়দের কাছে আজব ঠেকে, অদ্ভুত মনে হয়। অনেক সময় বড়োরা সে সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বলে থাকেন—তোমার এসব কথা জানবার বয়েস এখনও হয় নি, বড়ো হও তাহলেই সব বুঝতে পারবে। কিন্তু তাতে শিশুর মন তৃপ্ত হয় না। বার বার নিরাশ হলে তার বুদ্ধির উন্মেষ স্তব্ধ হয়ে আসে। জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা যায় কমে। তাই যতোদূর সম্ভব শিশুদের প্রশ্নকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে। সদুত্তর দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

শিশু সাধারণতঃ জ্ঞান আহরণের জন্য তার বিকচমান ইন্দ্রিয়গুলির ওপর নির্ভর করে। ঘরের বাইরে কুকুর ডেকে উঠলে, রাস্তা দিয়ে

গাড়ি চলে গেলে, কিচির মিচির ক'রে পাখি ডেকে উঠলে সেদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফুলের গাছে কুঁড়ি ধরলে, ফুল ফুটলে, আকাশের মেঘে রঙ লাগলে তার লক্ষ্য এড়ায় না। যেসব শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিকে আমরা অহরহ উপেক্ষা ক'রে চলি সেগুলিও শিশুর মনকে আকর্ষণ করে। সব কিছুর অর্থ আবিষ্কার করার জন্য তার মনে অদম্য কৌতূহল জেগে ওঠে। কম্বল গরম কেন, ভেড়ার গায়ে এত লোম কেন, ফুলের গায়ে বিচিত্র রঙ্ কেন, সূর্যাস্তের মেঘ রাঙা কেন, আকাশের রঙ্ নীল কেন, গান মিষ্টি কেন, চিনি মধুর কেন, পাখি ডাকে কেন ইত্যাদি সহস্র সহস্র প্রশ্ন তাকে বিমুগ্ধ করে। যে শিশু যতো বেশী প্রশ্ন করে তার মনের বিকাশ ততো বেশী এটা বুঝতে হবে। কিন্তু শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় মনে রাখতে হবে যেন উত্তরটা তার বোধগম্য হয়। সূর্য সকালে ওঠে, সন্ধ্যায় অস্ত যায় কেন,—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গ্যালিলিও বা কোপার্নিকাসের জটিল তত্ত্বের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তার চাইতে যদি বলা যায়—'সূর্য আমাদের আলো দিয়ে পাহাড়ের ওপারের দেশে যখন আলো দিতে যায় তখন আমরা আর তাকে দেখতে পাই না—আলোর অভাবে অন্ধকার নামে।

আবার পাহাড়-পারের দেশটাতে আলো দিয়ে যখন সূর্য আমাদের দেশে ফিরে আসে তখন আবার আলোয় চারদিক ভরে যায়, আমাদের দেশে আবার সকাল হয়—তা হলেই শিশু খুশী হবে, অথচ তাকে সহজ কথায় সত্যি কথাই বলা হবে।

অনেক সময় শিশুদের প্রশ্নগুলি মাতাপিতার নীতিবোধকে আঘাত করে। তাঁরা অস্বাভাবিক ভাবে রাগ করে থাকেন। এইসব প্রশ্ন করার জন্য শিশুকে তাড়না করেন, অনেক শাসন ক'রে থাকেন। এই রকম আচরণ করার ফলে প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল সহস্রগুণ বেড়ে ওঠে। যতো বাধা পায় ততোই তার আগ্রহ বেড়ে যায়।

ছেলেমেয়ের দেহগত পার্থক্য, সন্তান-জন্মের রহস্য ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নকে মাতাপিতা অপরাপর প্রশ্নের মতো সহজ করে গ্রহণ করতে পারেন না। এসব প্রশ্ন করার জন্য তারা শিশুকে রীতিমত ভয় দেখান। এর ফলে এসব বিষয়েই সে অধিকমাত্রায় উৎসুক হয়ে ওঠে এবং নানা জায়গা থেকে নানা রকমের কুৎসিত কুরুচি-সম্পন্ন ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে। মাতাপিতা যদি অতি সহজভাবে এই সব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দেবার চেষ্টা করেন তাহলে শিশুদের কৌতূহল চরিতার্থ হবে। অনেক সময় শিশুরা বার বার একই রকম প্রশ্ন করলে মাতাপিতা তার নীতিবোধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এটা কিন্তু অত্যন্ত ভুল। শিশুরা স্বভাবতঃই সেই সব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে যেগুলির সঙ্গে শুধু জ্ঞানপিপাসা জড়িত থাকে, কোন রকম আবেগের রঙ্ লাগে না। ফুল কি করে ফোটে? এ প্রশ্ন শিশু করে তার জানবার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাতাপিতা কোন রকম ইতস্ততঃ বোধ করেন না। সহজভাবে উত্তর দেন, তারও তাই একে ঘিরে কোন রকম আবেগের সঞ্চার হতে পারে না। উত্তরটা শুনলে শিশু সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু আরও অনেক দিকে তার মন চলে যাবার জন্য সে সহজে একথা ভুলে যায় এবং পুনরায় এই প্রশ্নই করে। কিন্তু আমার নতুন বোনটা কোথায় ছিলো, কী ক'রে হলো, জন্মালো কেমন ক'রে ইত্যাদি ধরণের প্রশ্ন ক'রে শিশু যখন তাড়না খায়, তখন তার মন বেশী ক'রে এই দিকেই আকৃষ্ট হয়। এই সব প্রশ্ন তার মনের ভেতর বেশীর ভাগ সময়ই ঘোরাফেরা করে। এগুলির বিষয়ে তার মনের ভাব আর সহজ থাকে না। কিন্তু তাড়না ও শাসনের ভয়ে পুনরায় সে মাতাপিতাকে এই সব প্রশ্ন করা থেকে নিরস্ত থাকে। শিশু যখন তার জন্ম বৃত্তান্ত মার কাছে জানতে চায় তখন তিনি বড়ো মুস্কিলে পড়েন। রূঢ় সত্য কথাটা তাকে বলা চলে না, সে কথা বুঝবার তার শক্তিও

নাই। অথচ কিছু একটা বলা চাই এবং সেটা যতদূর সম্ভব সত্য হয় ততোই ভালো। কিছু না বললে সে তৃপ্ত হবে না। তিরস্কার করলে এ বিষয়ে তার অস্বাভাবিক ভাবে কৌতূহল বেড়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে বলা চলতে পারে—তুই আমার পেটের ভেতর ছিলি, তারপর বড়োসড়ো হয়ে বেরিয়ে এসেছিস্। যদি বলে—কী ক'রে বেরিয়ে এলুম, তাহলে বলা যেতে পারে—পেট কেটে। আবার প্রশ্ন ক'রতে পারে শিশু—পেট কাটা কোথায়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে—কাটা জুড়ে গেছে ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার তো মনে হয়, এইটাই শিশুর পক্ষে সবচেয়ে সহজবোধ্য উত্তর এবং পরিপূর্ণ সত্য না হলেও এর মধ্যে সত্যের অপলাপ খুব কম আছে।

অনেক সময় শিশুরা নিজেদের এবং সঙ্গী-সাথীদের জননেন্দ্রিয় সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন ক'রে থাকে। এতে বিচলিত হবার কিছুই নাই। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো এই বিশেষ অঙ্গটি সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর ওপর বেশী দৃষ্টি দিলে এ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহলকে আরো বাড়িয়েই দেওয়া হবে সুতরাং এদিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ইজের বা কাপড় পরা না থাকলে অনেক সময় মাতাপিতা শিশুকে বকাবকি করেন। এর ফলেও তাদের দৃষ্টি একটা বিশেষ দিকে ধাবিত হয়। কৌতূহল বেড়ে ওঠে। তাকে তাড়না না ক'রে 'বেড়্' ক'রতে যাবার নাম ক'রে যদি ইজের বা কাপড় পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার নগ্নতা ঢাকার এই আয়োজন সম্বন্ধে সে কিছুই জানবে না অথচ অতি সহজে তার মধ্যে সমাজ-চেতনার উন্মেষ করা সম্ভব হবে। মোটের ওপর অপরাপর বিষয়ের মতো মাতাপিতাদের যৌন বিষয়টাকেও অত্যন্ত সহজ-ভাবে মেনে নিতে হবে।

পাঁচ বছরের পর

একটা পাথরকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেঙে যেমন টুক্‌রো টুক্‌রো করা সম্ভব, একটা মানুষের জীবনকে পুষ্টি ও বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিতে সময়ের হাতুড়ি দিয়ে কতকগুলো মাসে বা বছরে ভাগ ক'রে দেওয়া তেমন সম্ভব নয়। মানুষের দেহ ও মন একটা বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ ক'রে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং মানব-জীবনের দু' বছরকে পাঁচ বছর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক'রে দেখা সম্ভব নয়। পাঁচ-ছ' বছর বয়সে মানুষের যে সব অভিজ্ঞতা হয়, আট দশ বছর বয়সেও সেই সব অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে, যদিও এই সব অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, পরিধি, গভীরতা ইত্যাদির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। পাঁচ ছ' বছর বয়সে শিশু পাঠশালে যায়, নতুন নতুন সঙ্গী-সাথী, পাঠ্য বিষয়, গাছ-পালা, জীবজন্তুর সঙ্গে তার পরিচয়ের ফলে তার মনের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। তার দেহেরও ধীরে ধীরে পুষ্টিসাধন হয়।

এই সময় থেকেই শিশুরা মা-বাবার ওপর নির্ভরশীলতার ভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠতে থাকে। এমন কি সকলের সামনে অতিরিক্ত আদর আপ্যায়নও তেমন আর সে পছন্দ ক'রতে চায় না। সে এখন মনে ক'রতে থাকে যে, সে আর ছেলেমানুষ নেই, কাজেই তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করা হোক। তার দায়িত্বজ্ঞানও আগের থেকে বাড়ে। এই সময় শিশুরা তার থেকে বয়সে বড় ছেলেমেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের বেশভূষা, ইত্যাদির নকল করতে চায়। নতুন ভাবধারা বা জ্ঞানের জন্য পরিবারের বাইরে শিক্ষক বা কিশোর পরিচালক ইত্যাদির দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে। ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে আশে পাশের জগতই এখন তাকে বেশী আকৃষ্ট করে। এমন কি আগেকার দিনের খেলাধূলোও তার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হতে থাকে। এই সময় নিয়মকানুন মেনে খেলায় সে যোগ দিতে

চায়। দল বা সঙ্ঘে যোগ দিতে চায়। মোটকথা পরবর্তীকালে পারিবারিক স্নেহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, তাকে যে-বৃহত্তর জগতে স্বাধীন ভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে একলা চলতে ফিরতে হবে, তারই শিক্ষা সুরু হয়। মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা অবিশ্যি তাই বলে কমে যায় না, সেটার প্রকাশ বাহ্যিক না হয়ে ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে।

অভিভাবক বা পরিচালক হিসাবে এই সময় আমাদের উচিত যে, পরিবারে বাইরে, শিশুর সামাজিক জীবন সকলের সাথে সহজ ও সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে যাতে গড়ে উঠতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাকে সাহায্য করা। এদিক দিয়ে শিশুকে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, তাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে, তার বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় শিশু ও শৈশব। শৈশবের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এই রকম একটা ক্ষুদ্র রচনায় [illegible]। প্রধান প্রধান বিষয়গুলি শুধু তাই আলোচনা করেছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে উৎসাহ ও সহানুভূতি পেলে আরও অনেক জটিল জটিল শিশু-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

* প্রকাশক
শ্রীসলিল পাল
কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন,
হাওড়া

* ব্যবস্থাপনা
শ্রীঅনিল সেন

* মুদ্রক
জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৪১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

* সম্পাদক
নির্মল চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান
অশোক লাইব্রেরী
১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ ষ্ট্রীট)
কলিকাতা—১২

* প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর—১৯৫০

* দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর—১৯৫২

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা ✱ শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

প্রকাশিত পুস্তিকাবলী

১। শিশু ও শৈশব
২। শিশু পালনে কোনটি চাই—
বংশগতি না পারিপার্শ্বিক
৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায়
পিছিয়ে পড়ে ?
৪। কিশোর ও কৈশোর
৫। শিশু অপরাধ ও অপরাধী
৬। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন (যন্ত্রস্থ)

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

প্রতিটির দাম
চার আনা মাত্র